Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আত্মহত্যা কি আত্মমর্যাদা রক্ষার পথ হতে পারে? - একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড. মৃণাল কান্তি সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিধাননগর কলেজ, কলকাতা, ভারত

Abstract:

The word 'Suicide' is familiar to human civilization from the early stage of it and it is still a hard reality in spite of so much development in human civilization. The dark shadow of suicide or self killing covers all time, every corner of the world and each and every society. The percentage may vary from country to country or on the basis of individual social structure, but incidents of suicide is omnipresent. For an example, we can talk about Japan's alarming situation regarding suicide. Sociologists and psychologists mainly blame work culture of Japanese society for this shocking reality .

We will look for different definitions of suicide and will analyse the same from religious, psychological and philosophical point of views in this article. We will try to explore how thinkers or philosophers from different time frames observed suicide around the globe. Majority of philosophers raised their voices against this practice and advised to learn how to live and face in difficult times in life. But on the other hand, we will see a philosophical view too that endorses suicide practice. So, we can surely say that this article will tell us a diversified view on suicide.

We will observe that great Greek philosophers like, Socrates, Plato, Aristotle from ancient times criticized the practice of suicide openly. They argued against suicide as life is God's wise gift to all living creatures on the planet and being the most intelligent and civilized creature, human should respect God by living this life in decent way instead of eliminating it going against nature. They all claimed that act of suicide actually is a plain case of challenging God's sovereignty.

And we will face those hard real situations also when a person ends own life as he/ she find no other alternative way to live a dignified life. This is a state of human life when the act of suicide can't be questioned from ethical or legal ground, but we should consider these situations from humanitarian ground.

Keywords: Suicide, philosophical aspect, religious aspect, Psychological aspect, Self killing, Human dignity

ভূমিকা: যে কোনো হত্যাই নিন্দনীয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা সে আত্মহনন হোক কিংবা এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তির প্রাণ নাশ। তা সে পশু হত্যা বা মানব হত্যা, যাই হোক না কেন! এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ চায় সুস্থভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে। মানুষের অন্তরের শান্তি যখন কোন নির্দিষ্ট কারণে বিঘ্নিত হয় এবং সেই নির্দিষ্ট মানুষটি যখন নিজ প্রত্যাশিত মানের জীবন যাপন করতে কোন একটি বা একাধিক কারণে ব্যর্থ হন, এমন পরিস্থিতিতে সেই মানুষটি আত্মহনন বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আসলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের শিকড় জুড়ে আছে মানুষের নিজেকে ভালোবাসা এবং সুখে জীবন যাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং প্রত্যাশার সাথে।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দার্শনিক মহলে আত্মহননের এই রীতিকে বিভিন্ন দার্শনিক যেমন নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের নিরিখে বিচার করে অন্যায় বা পাপ বলে চিহ্নিত করেছেন, অপর প্রান্তে এমন দার্শনিকও আছেন যারা মানুষের প্রত্যাশিত জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটার কারণে আত্মহত্যার মত চরম সিদ্ধান্তকে নৈতিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এই বিশ্বে যে কোনো বিষয়েরই পক্ষে এবং বিপক্ষে যেমন জনমত বিভক্ত হয়ে যায় অনুরূপভাবে মানুষের আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের বিষয়টিকে ভিত্তি করেও সাধারণ মানুষ কিংবা পন্ডিত সমাজ সময়ের বিভিন্ন ধাপে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে কারণ প্রকৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই মানুষের সিদ্ধান্তের বা মতামতের বৈচিত্র একটি স্বাভাবিক বিষয়।

আত্মহত্যা কাকে বলে?

'আত্ম' অর্থাৎ নিজেকে হত্যার পন্থাকেই আত্মহত্যা বলা হয়। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে হত্যাকারী এবং হত মানুষ দুজনেই এক। অনুরূপভাবে আত্মহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ, "SUICIDE" - এর মূল লাতিন ভাষায় জড়িয়ে আছে। লাতিন শব্দ, "SUICIDIUM" থেকে ইংরেজির "SUICIDE" শব্দটির আগমন, যার অর্থ - নিজের জীবন সংহারের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষের জীবনের অবসানের জন্য সেই নির্দিষ্ট মানুষটি নিজেই দায়ী অথবা এই মৃত্যুর কারণ সেই ব্যক্তি নিজেই। কিন্তু এই আপাতঃ কারণ ভিন্ন নিজের অস্তিত্বকে আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধনের এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে, অবশ্যই অন্য এক কারণ বর্তমান থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণের পন্থায় দেখা যায় যে সেই কারণের বহু স্তরের অস্তিত্বও থাকতে পারে।

একজন মানুষ যখন কোন জীবনের নেতিবাচক মানসিক পরিস্থিতিতে কিংবা নেতিবাচক শারীরিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট মানসিক অস্বাভাবিকতা থেকে নিজের জীবনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সকল মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ জীবন উৎসর্গ করার পিছনে অভিপ্রায় বড় ভূমিকা পালন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে, সেই জীবন উৎসর্গের পন্থাকে আত্মহননের তকমা দেওয়া যেতে পারে কিনা? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন একজন সৈনিক নিজের মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত জেনেও রণক্ষেত্রে অটুট থাকেন এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন, সেই ঘটনাকে কখনোই আত্মহত্যা বা আত্মহননের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কারণ এমন পরিস্থিতিতে একজন সৈনিক কখনোই নিজের কোন ব্যক্তিগত নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ হিসাবে আত্ম বলিদানের পথকে বেছে নেন না। একজন সৈনিকের জীবন উৎসর্গের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অনেক বেশি মহৎ এবং নীতি নির্ভর। অপরপক্ষে আত্মহত্যা সর্বদাই নীতি গর্হিত বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে মানব সভ্যতার বহু পুরাতন পর্যায় থেকেই।

আত্মহত্যার প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন বা তাগিদ অনুভবের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করার বিশ্বজুড়ে নানান সময়ে প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আমরাও এখানে তেমনি কিছু সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমত, R B.Brandt বলেছেন - 'একজন মানুষের জীবন যদি তার দ্বারাই ইচ্ছাকৃতভাবে সমাপ্ত হয় তাহলে সেই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে'।

দ্বিতীয়ত, সমাজ বিজ্ঞানী দুর্খাইমের দৃষ্টি থেকে বিচার করে বলা যায় যে আত্মহত্যা শব্দটির সাহায্যে এমন মৃত্যুর ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয় যেখানে একজন মানুষের সদর্থক বা নিষেধাত্মক কাজের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেরই জীবনের অবসান হয়। এই মৃত্যু অবশ্যই সর্বদাই পরিকল্পিত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্যকভাবে অবহিত যে নিজ মৃত্যু অবধারিত।

তৃতীয়ত, Maris - এর মতানুসারে, একজন নির্দিষ্ট মানুষ যখন মৃত্যুর সম্ভাবনার বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়েও সেই জীবন ধারাকে বেছে নেন এবং অন্তিমে সেই পন্থা বাস্তবিকই সেই নির্দিষ্ট মানুষটির জীবনের অবসান ঘটায়, তখন সেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলা হয়।

আলোচিত তিনটি সংজ্ঞাই আপাতভাবে আত্মহত্যার সংজ্ঞাকে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত বা বর্ণনা করেছে বলে বোধ হলেও, বাস্তবে তিনটি সংজ্ঞাই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমে উল্লেখিত দুটি আত্মহত্যার সংজ্ঞার কোনটিতেই Motive বা অভিপ্রায়ের কোন রকম উল্লেখ নেই। একজন মানুষ কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে অপর মানুষের জীবন রক্ষার্থে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সেই অপর ব্যক্তিকে উদ্ধারের কাজে লিপ্ত হতে পারেন এবং সেই প্রচেষ্টার সময়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটতে পারে। কিন্তু কোনমতেই এমন ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে বিবেচনা করা সমীচীন নয়।

তৃতীয় সংজ্ঞাটি নিয়েও আমরা যদি আলোচনা করি সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য করব যে যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে পর্বতারোহী বা অন্য যে কোন প্রকার দুঃসাহসী অভিযানে বা কাজে লিপ্ত মানুষদের বিষয়ে উল্লেখ করি, সেক্ষেত্রে তাঁদের যাত্রা পথের নানান বাঁকে মৃত্যু যে কোনো সময় সামনে এসে দাঁড়াতে পারে এই বিষয়ে অবগত থেকেও, তাঁরা অভিযানে এগিয়ে যান। এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা খবরের শিরোনামে এই ধরনের অভিযাত্রী দলের সদস্য বা সদস্যাদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে থাকি। অর্থাৎ নিজেও মৃত্যুর সম্ভাবনার বিষয়ে প্রায় সুনিশ্চিত হয়েও সেই নির্দিষ্ট পথকে বেছে নেওয়ার মানসিকতা এবং কোন মানুষের আত্মহত্যার মানসিকতাকে কখনোই সমার্থক হিসাবে বিবেচিত করা যায় না এবং তা অনুচিৎ।

বিশ্ব জুড়ে আত্মহত্যার নানান দৃষ্টান্তের দিকে একটু নজর দিলেই আমরা খুব সহজেই অনুভব করতে পারব যে উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞা তিনটিই অপূর্ণতার দোষে দুষ্ট। সামাজিক মনস্তত্ত্বের স্তর অনেক। একটি আত্মহত্যার ঘটনার পিছনের কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণীকরণের দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আমাদের আলোচনার স্পষ্টতার সুবিধার্থে আমরা কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে সক্ষম হব যে, আত্মহত্যার কত প্রকারের রূপ বর্তমান আমাদের সমাজে।

(ক) একটি ছেলে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার ঘটনার কথা বলি। ছেলেটির বাবা স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন এবং সন্তানকে প্রতিদিন সকালে উঠে শরীর চর্চার জন্য যেতে নির্দেশ দিতেন। অন্যথায়

সন্তানকে মারের ভয় দেখাতেন। ছেলেটি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারতো না এবং এর জন্য বাবা যে মারবেন, সেই আতঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হিসাবে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

(খ) দ্বিতীয় ঘটনা এক ভদ্রলোকের। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার সমস্যা ছিল এবং স্ত্রীর একগুঁয়ে আচরণে বিতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

(গ) এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজন অধ্যাপক। তিনি আক্ষরিকভাবে জানতে পারেন নিজের ক্যানসারের কথা এবং তাঁর মৃত্যুও আসন্নপ্রায়। এমন পরিস্থিতিতে সেই অধ্যাপক আত্মহত্যার মাধ্যেমে নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেন কারণ তিনি ক্যানসারের বেদনার সম্মুখীন হতে চাননি।

(ঘ) চতুর্থ দৃষ্টান্তে দেখতে পাই এক ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করেন আকস্মিকভাবে তাঁর আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য। তিনি আশঙ্কা ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কাঠিন্যের আতঙ্কে অবসাদে ভুগতে থাকেন। এবং পরবর্তীতে এই চরম সিদ্ধান্ত।

আমরা উপরে আলোচিত চারটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বিষয়টি সহজেই অনুভব করতে পারি যে সকল আত্মহত্যার ঘটনার পিছনের কারণের গভীরতা সমান নয়। এবং মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা তখনই সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাড়ে যখন জীবন সেই নির্দিষ্ট মানুষটির প্রত্যাশা অনুযায়ী চলে না। প্রতিটি মানুষই সুখের প্রত্যাশী। সেই সুখ যখন অনিশ্চয়তার কবলে পড়ে, মানুষও তখন আত্মহত্যার হাতছানির কবলে পড়ে।

কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এই আত্ম বিলোপের পথকে কি কোনও পরিস্থিতিতেই সমর্থন করা যায়? দার্শনিকরা কি বলছেন? আমরা এই পর্যায়ে কিছু বিশিষ্ট দার্শনিকদের আত্মহত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব।

সক্রেটিস মনে করতেন যে মানুষের যে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ, তাকে আকস্মিকভাবে থামিয়ে দেওয়ার অধিকার বা নৈতিক যৌক্তিকতা কোনটাই মানুষের কাছে থাকা কাম্য নয়। নিজেও যে বিষ পান করেন সেটিকেও তিনি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই বিধান হিসেবে দর্শিয়ে নিজের আত্মহরনের উদ্যোগকে যুক্তিসংগত হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন।

অনুরূপভাবে প্লেটো তাঁর রচনায় সরাসরি আত্মহত্যার সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, জীবনে কঠিন সময় বা দুঃখের সময় অবশ্যই আসবে কিন্তু সেই দুঃসময় কখনোই আত্মহত্যার পন্থাকে বৈধতা দিতে পারে না। জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনি পরম সৃষ্টি কর্তা। প্লেটোর মতে মানুষ যদি নিজের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করে, তা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করার সমার্থক এবং তা কখনোই অভিপ্রেত নয়।

পরবর্তীকালে দেখা যায় প্লেটোর অন্যতম ছাত্র বিশিষ্ট গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তিকে সামাজিক এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, মানবসমাজ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে টিকে আছে। প্রত্যেকটি মানুষ একে অন্যের পরিপূরক। প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এমন সামাজিক কাঠামোয় কোন নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নিলে আসলে তা সামগ্রিকভাবে সেই সমাজের ক্ষতি সাধন করে। নীতিগতভাবেও অ্যারিস্টটল আত্মহত্যাকে

সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, নৈতিকভাবেও আত্মহত্যা কখনোই মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। জীবনের নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যাকে আঁকড়ে ধরা, আসলে কাপুরুষতার পরিচয়াক।

টমাস একুইনাস আত্মহত্যাকে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন, কারণ আত্মহত্যা প্রকৃতপক্ষে সাহস এবং ধৈর্যের অভাবজনিত সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, একজন স্বতন্ত্র মানুষের আত্মহত্যার ফলে সামগ্রিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একজন সুনাগরিকও নিজের জীবন হারান। প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য নিজেকে পরম সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করে সমাজের অন্যান্য মানুষের ভালোবাসা এবং কল্যাণের উপলক্ষে বেঁচে থাকা।

একুইনাসের মতে, মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু কেবলমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই ধর্মীয় বিধান এবং সেই ঐশ্বরিক অধিকারের অভ্যন্তরে মানুষের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। ঈশ্বর মানুষের হাতে স্বাধীনভাবে কাজ করার যে অধিকার প্রদান করেছেন, মানুষের উচিত সেই সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ থাকা। ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়ার বিষয়ে মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক নয়। জীবনে প্রতিকূল উপস্থিতি একটি স্বাভাবিক বিষয়, সেখান থেকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কাম্য হতে পারে না।তিনি বলেছেন নিজের কোনো অপকর্মের ফলে সৃষ্ট আত্মগ্লানী থেকে প্রায়শ্চিত্তের প্রত্যাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়াও সমর্থনযোগ্য নয় এবং তা অপরাধ ও অন্যায় বলে বিবেচি হবে। এমনকি কোন নারীর সম্মানহানির সম্ভাবনা দেখা দিলে বা অনুরূপ ঘটনা ঘটলেও, আত্মহত্যা কোন নৈতিক বা বাস্তবিক সুরাহা নয়। বরঞ্চ এই পরিস্থিতিতে অপরাধীর প্রচলিত বিধান অনুসারে শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দার্শনিক কান্টও প্রায় একই রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আত্মহত্যা করার অর্থ, ঈশ্বরের অভিপ্রয়ায়ের বিরোধীতা করা। মানব সমাজ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, সে কারণে সকল মানুষই ঈশ্বরের সম্পদ। তাই সেই সম্পদ রক্ষা করা মানুষেরই দায়িত্ব। প্যান্টের মতে আমাদের জীবনের অবসান ঈশ্বরের অভিপ্রায় হওয়া উচিত এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় জীবন যাপন করা নৈতিক বলে বিবেচিত। নিজের জীবনের নিজের অস্তিত্বের বিলক সাধন করা সমর্থনযোগ্য নয়।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আত্মহত্যার বিষয়টি বিশ্লেষণ করার সময় আমরা সিগমন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব। তিনি বলেছেন যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা সামাজিক জটিলতার কারণেই একমাত্র মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন না। এর পিছনে মানুষের ব্যক্তিগত মানসিক কারণ দায়ী থাকে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি হলো প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা। মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের মৃত্যুতে অন্যের প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে চায়। তাঁর বক্তব্য হলো, আত্মহত্যা আসলে প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী নয়। তিনি আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পেয়েছেন একজন মানুষের শৈশবের কষ্টদায়ক ও তিক্ত জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে।

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মানুষের দুটি প্রেষণা আছে। একটিকে বলে ‘ইরোজ‘, যা বাঁচার প্রবৃত্তির কারণ। অন্যটি হচ্ছে ‘থানাটোস‘ যা মৃত্যুর প্রবৃত্তির কারণ। যখন থানাটোস ইরোজের থেকে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ইরোজকে অবদমন করতে সক্ষম হয়, তখনই মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।

আত্মহত্যা কি নৈতিকভাবে নিন্দনীয়?

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত অনৈতিক বা অন্যায় বলে সার্বিকভাবে ঘোষণা করা যায় না। একজন মানুষ আত্মহত্যা করলে কেবলমাত্র আত্মহত্যা করেছে এই কারণেই সেই কাজটিকে অন্যায় বা অপরাধ বলা যায় না এবং নির্দিষ্ট মানুষটিকে অপরাধী বলে ঘোষণা করাও অনুচিৎ। কারণ অন্যান্য যে কোন কাজের মতো এই ক্ষেত্রেও তার নৈতিক মান নির্ধারণের জন্য যেটি একান্ত প্রয়োজন, তা হলো সেই কাজটির পেছনে এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়। একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করতে পারি, যে পরিস্থিতিতে একজন মানুষ আত্মহত্যার মতো কঠিন ও চরম সিদ্ধান্ত নিলেও, তাকে অন্যায় অপরাধ বলে বিবেচনা করা যায় না সর্বাধিকভাবে সেই কাজটিকে খারাপ বা দুঃখজনক হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ আমরা এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করতে পারি যেখানে একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ নিজের পারিবারিক আর্থিক দুর্বল অবস্থার কথা চিন্তা করে, আত্মহত্যা করতে পারেন। যাতে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় হলে পরিবার আগামী দিনে সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এমন পরিস্থিতির উল্লেখ করতে পারি যেখানে একজন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এক্ষেত্রে কোন নৈতিক মানদন্ডের নিরিখে এই ঘটনাকে বিচার বিবেচনা করা সম্ভবপর নয়, কারণ যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছেন তিনি নিজে স্বাভাবিক মানসিক পরিস্থিতিতে ছিলেন না। অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় থাকা কোনো মানুষের কোনো কাজকে নৈতিককতার নিরিখে বিচার অসম্ভব।অথবা মানসিকভাবে সুস্থ থাকলেও কোন মানুষ অবসাদ বা হতাশা বা ভীতির মধ্যে আত্মহত্যা করলে, তাকেও নৈতিক দিক থেকে নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করা অনুচিৎ। কারণ সেই মানুষটি সেই সময়ে মনের কষ্টে ভুগছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে নৈতিক যুক্তি, বিচার - বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়।

আত্মহত্যার পক্ষে যুক্তি: আত্মহত্যাকে নৈতিকভাবে, মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় - এরূপ নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্যায়, অপরাধ বা পাপ বলে বিবেচনা করা হলেও অনেকেই আত্মহত্যাকে সমর্থন করেছেন। এই সকল দার্শনিকদের মধ্যে দার্শনিক, ডেভিড হিউম ছিলেন অন্যতম। তিনি সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

হিউম প্রথমেই আত্মহত্যার সাথে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যের অবহেলার তত্ত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে জড় জগৎ এবং প্রাণীজগতদের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব বর্তমান এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকলেও এই বিশ্বের নানান অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। এর মাধ্যমে কোনও এক চৈতন্যশীল অস্তিত্বের ধারণা করা হয়, যাকে ঈশ্বর রূপে আমরা স্বীকার করি। এ জগতের সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রাণীদের বিশেষত মানুষকে নিজের জীবনের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ক্ষমতা হিসেবে আবেগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা শক্তি, স্মৃতি, বিচার-বিবেচনার শক্তি ইত্যাদি দিয়েছেন। এবং সেই বিচার বুদ্ধি আবেগ ইত্যাদির দ্বারা নিজের জীবনের পরিস্থিতি অনুসারে মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত মানুষ নিয়ে থাকে। হিউম মানুষের এই ইচ্ছায় নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার কর্মপদ্ধতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। হিউম মনে করেন, যে যে ইচ্ছা ও বিচার শক্তি, বুদ্ধি ও আবেগের দ্বারা একজন মানুষ নিজের জীবনের বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরেরই প্রদত্ত। মানুষের আবেগ, ইচ্ছা, বিচার - বিবেচনা সকলেই ঈশ্বরের প্রকাশ।

হিউম আত্মহত্যার সমর্থনে অপর একটি যুক্তিতে বলেছেন যে, একজন মানুষ যখন আত্মহত্যা করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুপস্থিতির কারণে সমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারে না কিন্তু তার সাথে

সমানভাবে এটাও সত্যি যে সেই ব্যক্তি সমাজ থেকে আর কোনও সেবা গ্রহণও করে না। যদি কোনো মানুষ জীবনের শারীরিক কিংবা মানসিক অস্বাভাবিকতা বা প্রতিকূলতার মধ্যেও আত্মহত্যা না করে বেঁচে থাকতেন, মানুষটি সেক্ষেত্রে নিজে সমাজের থেকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা বা সেবা গ্রহণ করতেন কিন্তু বিনিময়ে সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। অর্থাৎ সমাজের কাছে সেই ব্যক্তি দায় বা বোঝা হিসেবে প্রতিহত হতেন। একজন মানব সম্পদ হিসেবে নয়। এই পরিস্থিতির সাপেক্ষে আত্মহননের মাধ্যমে সমাজকে সেই দায় থেকে মুক্তি দেওয়াকেই হিউম সমর্থন করেছেন।

সুখবাদী দার্শনিকদের প্রধান কথাই হল, জীবন থেকে দুঃখ বা কষ্টের পরিমাণ যত পরিমাণ সম্ভব লাঘব করা এবং সুখের পরিমান যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা। মানুষের জীবনে সুখ বা স্বাচ্ছন্দে প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে মুহূর্তে মানুষের জীবনে সুখের থেকে দুঃখ বা কষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ তার প্রত্যাশিত সুখ থেকে বঞ্চিত হয় এমতাবস্থায় সেই নির্দিষ্ট মানুষটি নিজের ইচ্ছায় সুখী জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

এছাড়াও আমরা উল্লেখ করতে পারি, কৃপাহত্যা বা ইউথেনেশিয়া পদ্ধতির কথা, যেখানে একজন মুমূর্ষু রোগী বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যু কামনা করতে পারেন এবং চিকিৎসকের সহায়তায় নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার বিজ্ঞানভিত্তিক সহায়তা লাভ করতে পারেন। এই ইউথেনেশিয়া পদ্ধতির সমর্থন কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য বা ন্যায্য যেখানে সেই নির্দিষ্ট রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা একেবারেই নেই এবং তা চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।অর্থাৎ আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, একজন মানুষ নিজ উদ্যোগে অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি তখনই ঘটাতে চান যখন সেই মানুষটি নিজের পূর্বের স্বাভাবিক এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জীবনযাপনে অপারগ হয়ে ওঠেন। প্রতিটি মানুষেরই জন্মগত অধিকার আছে নিজের জীবনে আত্মমর্যাদা সহ বেঁচে থাকার।আত্মমর্যাদা ততক্ষণই অক্ষুন্ন থাকে যতক্ষণ সেই মানুষটি সক্রিয় থাকতে পারেন শারীরিক এবং মানসিকভাবে। শারীরিক বা মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা অক্ষম কোন ব্যক্তি পরিবার এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের মর্যাদা বা সম্মান লাভ আর করেন না। বরঞ্চ সমাজ এবং সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিজের পরিবারের সদস্যরাও ধীরে ধীরে এই মানুষটির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এমন পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট মানুষটি অপমান বোধ এবং অমর্যাদা বোধে ভুগতে থাকেন।এরই ফলস্বরূপ একজন মানুষ সসম্মানে নিজের মৃত্যুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে শরীর ত্যাগ করতে চান। একজন মানুষ যখন দীর্ঘদিন কোন শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন এবং নিজেকে অসহায় অনুভব করতে থাকেন, সেই পরিস্থিতিতে জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুকে নিজে পরিচালনা করতে পারার মধ্যে এক আত্মমর্যাদা এবং আত্ম অধিকারবোধ খুঁজে পান।

উপসংহার: আমাদের এই আলোচনা মাধ্যমে একটি বিষয় সহজেই প্রতিভাত হয় যে, আত্মহত্যার ঘটনাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা নৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক সকল প্রকার দিক থেকেই নিন্দা অথবা সমালোচনা করা হয়। অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যেমন আত্মহত্যার বিরোধিতা করেছেন এবং জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচার পথ খুঁজে নেওয়ার পন্থাকে অবলম্বন করার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, উল্টোদিকে হিউমের মতো দার্শনিকও আছেন যিনি মানুষের স্বতন্ত্রতার অথবা চেতন স্বত্বার একটি প্রমাণ হিসেবে আত্মহত্যার ঘটনাকে সমর্থন করেছেন।

আমরা আলোচনার মাধ্যমে এটিও প্রত্যক্ষ করেছি যে, আত্মহত্যার বিভিন্ন ঘটনায় কারণের গভীরতা সমান নয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে সিংহভাগ মানুষের কাছেই আত্মহত্যাই একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় ধর্মীয় এবং সমাজ তাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা করে আমরা বলতে পারি, যেমন জৈন ধর্মে সান্থারা পন্থা আছে, যেখানে প্রায়পোবেশনে বা নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা খাবার এবং পানীয় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তা কখনোই একটি সক্রিয় এবং আত্মমর্যাদা পূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়।

আত্মত্যার মতো চরম সিদ্ধান্তকে আমরা তখনই মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করতে পারি যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপেই আত্মমর্যাদা সহ জীবন যাপনে ব্যর্থ। তাঁর সামনে আর কোন বিকল্প পথ যখন আর খোলা থাকে না। অন্যথায় কোনভাবেই মানব জীবনের মতো এতো মূল্যবান একটি সৃষ্টিকে ধ্বংস করা সমর্থনযোগ্য নয়।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. Durkheim, Emile. *Suicide - A Study in Sociology*; Routledge; London and New York; 1952.
2. Habib, M.A.R.; Modern Literary Criticism And Theory - A History From Plato To The Present; Blackwell Publishing; Australia; 2005.
3. Hirsch, K. Jameson; Chang, C. Edward; Rabon, Kelliher Jessica; *A Positive Psychological Approach to Suicide* - Theory, Research And Prevention; Springer; USA; 2018.
4. Hume, David; *The Treatise of Human Nature* (volume 1); Claredon Press; Oxford; 2007.
5. Jatava; D.R.; *A Philosophy of Suicide*; ABD Publishers; Jaipur, India; 2010.
6. Kuhse, Hegla & Singer, Peter (Ed.). *Bioethics: An Anthology,* Second Edition, USA: Blackwell Publishing Ltd, 2006.
7. Michael J. Cholbi; Praeger; *Euthanasia and Assisted Suicide*: Global views on choosing to end life; 2017.
8. Sirgy, M. Joseph; *The Psychology of Quality of Life* - Hedonic Well_Being, Self satisfaction And Eudaimonia; Springer; 2012.
9. Ziebert. Hans-Georg; Zaccaria. Francesco (Edit.); Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religious: The Right to Life and Its Limitations; Springer; 2019.
10. এ. এস. এম, আব্দুল খালেক। *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা,* ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০৯।
11. পাল, সন্তোষ কুমার।*ফলিত নীতিশাস্ত্র ,* প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ লেভান্ত বুকস, ২০২১।
12. রায়, প্রদীপ কুমার.*ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা,* কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন, ২০১১।